নাইরোবি থেকে মাসাইমারা
এক সুন্দরের আরাধনা

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

প্র কা শ ন

নাইরোবি থেকে মাসাইমারা : এক সুন্দরের আরাধনা
ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন
গ্রন্থস্বত্ব © লেখক ২০২৬
প্রচ্ছদ: শৈলী বিভাগ, দ্যু প্রকাশন

প্রকাশক: দ্যু প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ২০২৬

Nairobi Theke Masai Mara : Ek Sundarer Aradhana
[A TRAVELOGUE OF NAIROBI TO MASAI MARA]
by Ibrahim Chowdhury Khokon
Copyright © Author 2026
Cover Designed by DyuART
First Published: February 2026 by Dyu Publication

www.dyu.com.bd
ISBN: 978-984-29276-1-4
Printed & Bound in Bangladesh

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form, of by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the author and publisher, except where permitted by law.

উৎসর্গ

আমার জীবনের পথে ভদ্রলোক আর ভালো মানুষের সঙ্গে পরিচয়–তা কোনো নিয়মে ঘটে না। ঘটে আকস্মিকতায়। গুরুত্ব আর স্বাভাবিকত্বের মাঝখানে হেঁটে আসা কিছু মানুষ কখন যে সহযাত্রী হয়ে ওঠেন, তা নিজেও টের পাই না। এই পথচলার মধ্যেই কেউ কেউ থেকে যান–কথায় নয়, কাজে। প্রচারে নয়, নীরব উপস্থিতিতে।

বিপন্ন মানবতার পাশে দাঁড়ানো যে এক ধরনের নীরব সাধনা–তা বুঝেছি হিউম্যান কনসার্ন ইন্টারন্যাশনালের কাজ দেখতে গিয়ে। আর সেই সাধনার এক অবিচল মুখ মাসুম মাহবুব। কর্মে বিনয়ী, সিদ্ধান্তে দৃঢ়, আর ব্যবস্থাপনায় চৌকস। মানুষটি যেন দায়িত্বকে বহন করেন শব্দ ছাড়াই। নেতৃত্বের চেয়ে সেবাকে যিনি বড় করে দেখেন, আলোয় নয়–ছায়ায় দাঁড়িয়ে কাজ করতেই যাঁর স্বাচ্ছন্দ্য।

ভ্রমণ শুধু জায়গার নয়, মানুষেরও। কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা না হলে কিছু পথচলা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই বইয়ের ভেতরে যত শহর, যত মুখ, যত গল্প–তার নেপথ্যে আছে সেই বিশ্বাস, যে বিশ্বাস মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে শেখায়।

সেই বিশ্বাসের অপর নাম মাসুম মাহবুব-কে

সূচিপত্র

ভূমিকা	৭
ছায়াবৃতা	৯
কারিবু কেনিয়া	১৭
হরিণ, জেব্রা, ওয়াইল্ডবিস্ট	৩০
মাসাই গ্রামে রাত	৩৪
স্টিভেন ভ্রমণকাহিনির এক অধ্যায়	৪০
এক চিলতে শৈশব	৪৪
আছে বাংলাদেশ	৪৮
বাংলাদেশ ও কেনিয়া–এত মিল!	৫২
দুই সিস্টেম	৫৬
বিদায় নাইরোবি	৬০
সেই দেশটাই আমেরিকা	৬৪
ম্যাপিভুজি মিলেলি	৬৮
আলোছায়া	৭১
টিকটকের পাশে ইউটিউব পুলিশ	৭৫
বিস্তীর্ণ জঙ্গলে কংক্রিটের ফুলস্টপ	৭৮
রয়ে যায় রেশ	৮১
জুরি–তোমার জন্য	৮৫

ভূমিকা

আফ্রিকা। নামটা শুনলেই অনেক বাঙালি নাক শিটকান। কারণ তাদের মনে–আফ্রিকা মানে বড় বড় গাছে ঘেরা ঘন জঙ্গল; সেখানকার বাসিন্দা হিংস্র শ্বাপদ; আর কৃষ্ণকায়া ভয়ংকর মানব সন্তান, যাদের অনেকেই আবার নাকি নরখাদক। কিন্তু আমরা ভুলে যাই ঔপনিবেশিক শাসনে বা তার উত্তরাধিকারে বড় হওয়া আমাদের প্রজন্মের জন্য এই আখ্যান তৈরি করতে 'এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,/ নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,' মানুষ-ধরার দল। 'সভ্যের বর্বর লোভ'-এর অধিকারী পশ্চিমা সমাজ আফ্রিকার আর তার সন্তানের গায়ে সেঁটে দিল স্থায়ী কলঙ্কের তিলক। সেই কলঙ্কের রেশ এখনো বয়ে চলেছে আফ্রিকা। কারণ আমরাই। আমাদের পর্বতসম অজ্ঞতা।

এখানেই *নাইরোবি থেকে মাসাইমারা : এক সুন্দরের আরাধনা* বইটির সার্থকতা। বইটির পরতে পরতে দেখা মিলবে পাশের বাড়ির ছেলে ও মেয়েটির। খুঁজে পাবে এক বাংলাদেশকে। উপলব্ধি হবে আমি, আমরা, আমাদের সঙ্গে 'ওদের' আসলে কোনো পার্থক্য নেই। সবার রক্তের রং লাল। কান্নার পানি নোনতা। আনন্দ উদযাপনের ছবিটি একই শিল্পীর আঁকা। সর্বত্রই 'সুন্দরের আরাধনা'।

সিলেটের এক গ্রাম্য বালকের বিত্তের সর্বোচ্চ আঙিনায় চার দশক ফেরারি বিচরণ ও থিতু হওয়া–কোনোভাবেই ভেতরের মানুষটাকে বদলাতে পারেনি। তাইতো পরিব্রাজক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন ঘুরতে ফিরতে খুঁজে বেড়ান মানুষ। মানুষের মুখ। মানুষই তার আনন্দ-বেদনার কাব্য। আমেরিকা থেকে বিমানযাত্রা দিয়ে শুরু, তারপর কেনিয়ার পথে পথে এমন সব চরিত্রের সঙ্গে পাঠক পরিচিত হবেন, তারা যেন তার অনেক চেনা। হয়তো তিনিই ওটা।

বাংলার পাঠকের কাছে আফ্রিকাকে নতুন করে তুলে ধরার জন্য লেখককে ধন্যবাদ না জানালে তা হবে গুরুতর অপরাধ। এই বইয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তিনি। একই সঙ্গে নিজেকে আটকেছেন লেখক সত্তার জালে। ওই জাল কেটে তিনি যাতে বেরোতে না পারেন, সে দায়িত্ব লেখকের মতো পাঠকেরও।

শুভকামনা।

সেলিম খান
৭ জানুয়ারি ২০২৬, ঢাকা

ছায়াবৃতা

নাইরোবির দিকে যাত্রা করার আগে মনে নানা ধরনের আশা আর উদ্বেগ মিশে ছিল। আফ্রিকা—এখনও যে ছবিটি আমাদের মননে চিত্রিত, সেখানে ঝরঝরে বর্ণমালার মতো বনানী, শিকারি পশু, শহরের ঝলমলে আলো আর বিপরীতমুখী জীবনের মিলনের গল্প।

নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা শুরু। জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি ফ্লাইট কেনিয়ান এয়ারলাইন্সে। আফ্রিকার এ দেশটিতে ভ্রমণ আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন আন্তর্জাতিক সংস্থা হিউম্যান কনসার্ন ইউএস-এর নির্বাহী প্রধান মাসুম মাহবুব। কর্ম ও ভ্রমণ—দুটি ক্ষেত্রেই পাগল এই মানুষটি। আগেও তাঁর সঙ্গে বসনিয়া সফর করেছি, অদেখা জগত দেখে বিমোহিত হয়েছিলাম।

ব্যস্ত বিশেষজ্ঞ। আমার জীবনও শৃঙ্খলার মধ্যে সাজানো—এ বিষয়ে নিত্য উপদেশ পাই ঘর থেকে। ভ্রমণের ব্যাপারে আমি আমার কাজিন মঈনুস সুলতানের প্রতিটি পরামর্শ মেনে চলি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ নিয়ে তাঁর লেখা এক নিঃশ্বাসে পড়া যায়। আফ্রিকার দেশগুলো নিয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। জর্জিয়ায় সস্ত্রীক বসবাস করা মঈনুস সুলতান ভাইকে ফোনে পাওয়া কঠিন।

মঈনুস সুলতান ভাইয়ের কাছ থেকে ডোসেন্ট—শব্দটা প্রথম শুনে ভয়ই পেলাম। মনে হলো যেন কোনো নতুন রোগের নাম। কেউ যদি বলে, 'তোমার রিপোর্টে ডোসেন্ট পজিটিভ'—তাহলে কি মাথা ব্যথা নাকি আত্মা ব্যথা শুরু হবে, বোঝা মুশকিল।

মিউজিয়ামে আমি যাই। ঘুরি। দেয়ালে ঝুলে থাকা মোনালিসার দিকে তাকাই—ভাবি, এটা কি শিল্প, না কি প্রকৃতি নিজেই নিজের মুখ দেখতে এসেছে? আর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া লিসার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সেও তো কম শিল্প নয়!

শিল্প আর প্রকৃতির এই মিশ্র জগতে আমি এক বিভ্রান্ত দর্শক। চিত্রের মাঝে খুঁজি নিজের ছায়া।

ফোন দিলাম অগ্রজ মঈনুস সুলতান ভাইকে। উদ্দেশ্য—কেনিয়ার নাইরোবি শহরটা সম্পর্কে জানা। সৈয়দ মুজতবা আলী নেই। আমাদের সৌভাগ্য—আছেন মঈনুস সুলতান। তাঁর কাছ থেকে পৃথিবীর শহর নয়, শহরের আত্মা সম্পর্কে জানা যায়।

সমস্যা হলো, তাঁকে ধরা মুশকিল। অবসরে যাওয়া মানুষ। যদিও অবসরের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। শত রোগব্যাধির মাঝেও তিনি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কখনও বিপন্ন অভিবাসীর পাশে, কখনও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে।

ফোন ধরে বললেন, 'মিউজিয়ামে ডোসেন্ট হিসেবে স্বেচ্ছাসেবার কাজ করছি।'

থমকে গেলাম।

'ডোসেন্ট?' মনে হলো, নতুন কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নাম শুনলাম।

নাইরোবির পথে পথে

আমার ফোনালাপের ইতিহাসে এমন অনেক মুহূর্ত আছে, যেখানে বুদ্ধি ফলাতে গিয়ে নিজেই ফল হয়ে ঝুলে থাকি।

এবারও তাই হলো।

তিনি ধৈর্য ধরে বোঝালেন—মিউজিয়ামে ডোসেন্ট হলো এমন এক ব্যক্তি, যিনি ছবির গল্প শোনান। তিনি গাইড নন, কারণ পথ দেখান না। শিক্ষকও নন, কারণ পরীক্ষা নেন না। তিনি গল্পের সেতুবন্ধন—দর্শক আর শিল্পীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একধরনের আলোকিত সংযোগ ঘটান।

গল্প এখানেই শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মঈনুস সুলতান ভাই গল্পে থামেন না, তিনি গল্প ঘোরান।

চিত্রকলার কথা থেকে চলে গেলাম সাহিত্যে। জিজ্ঞেস করলাম, 'এসব আবার কবে থেকে শিখলেন?'

তিনি বললেন, এক আত্মীয় একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কবি হলে কবে থেকে মঈনুস সুলতান?'

আমাদের কায়সুল ভাই (মঈনুস সুলতানের ডাক নাম) হেসে বলেছিলেন, 'কবি তো ক্যালেন্ডারের তারিখ দেখে হওয়া যায় না!'

আমি চুপ করে গেলাম—নিজেকে আবার বোকা মনে হলো, তবে এ এক আনন্দদায়ক বোকামি।

কথায় কথায় উঠে এলো খাহলিল জিব্রান, *The Prophet*, মানুষের আত্মার যাত্রা, প্রেম, নিঃসঙ্গতা। তাঁর কণ্ঠে প্রতিটি বাক্য যেন একেকটি ছোট গল্প, প্রতিটি বিরতিতে একেকটি নতুন অধ্যায়ের সম্ভাবনা।

কিন্তু গল্পের দেশে যাওয়ার আগে গল্প বলার মানুষ মঈনুস সুলতানের সঙ্গে কথা না বললে ভ্রমণটা কেমন যেন অপূর্ণ লাগে। জীবন যদি এক বিশাল মিউজিয়াম হয়। মঈনুস ভাই নিঃসন্দেহে তার অন্যতম সেরা ডোসেন্ট।

তিনি শুধু ছবির ব্যাখ্যা দেন না, মানুষ নামের চিত্রটাকেও নতুন আলোয় দেখান।

শান্ত নাইরোবি

আমি এখনো সেই দর্শক—বিভ্রান্ত, কৌতূহলী, আর মুগ্ধ—মোনালিসার বা লিসার হাসি দেখার মতোই!

মঈনুস সুলতান ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু বাস্তব টিপস নিয়ে, ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি সম্বল করে কেনিয়ার পথে যাত্রা।

কেনিয়ান এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে আমি এবং একমাত্র শ্বেতাঙ্গ যাত্রীটি। তেরো ঘণ্টার দীর্ঘ, নিরবচ্ছিন্ন উড়াল নাইরোবির পথে। চারপাশে কৃষ্ণাঙ্গ নারী-পুরুষদের সঙ্গে বসে যেন নিজেকে ইতিহাসের কোনো অভিযাত্রার সহযাত্রী মনে হচ্ছিল।

চিপসের প্যাকেট খুলতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলাম। পাশের আসনে বসা নারী মুচকি হেসে এগিয়ে এলেন, 'Let me show you,' বলেই মুহূর্তেই খুলে ফেললেন।

আমি হেসে বললাম, 'খোলাখুলির বিষয়টা আমাকে আগেও কয়েকবার শেখানো হয়েছে, কিন্তু এখনও একবারের চেষ্টায় তা কেন যে পেরে উঠি না।'

কয়েক সেকেন্ড আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন, 'You are in real trouble, young man!'

ষাট পেরুনো তরুণকে পশ্চিমারা যখন ইয়াং ম্যান বলে সম্বোধন করে, বেশ ভালোই লাগে। মুহূর্তে নিজের মধ্যে যৌবন কতটা ধরে রাখা গেছে, দ্রুত বিষয়টা পরখ করে নিই।

হাসিতে সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিলেন ডান পাশের তরুণীটিও। মুহূর্তেই পরিচয় হয়ে গেল—বাম পাশে লিডিয়া, ২৪ বছর বয়সী এক টিকটকার। ডান পাশে জুরি। কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা, আলাপচারিতা—তিন সারির যাত্রীরা একসঙ্গে যেন এক ছোট্ট কমিউনিটিতে পরিণত হলাম।

আলাপের ফাঁকে জানা গেল, আমেরিকা থেকে অনেকেই নিয়মিত কেনিয়া কিংবা আশপাশের দেশে যান। কেউ এনজিওর কাজে, কেউবা ধর্মপ্রচারে। আফ্রিকার দরিদ্র পীড়িত জনপদে পশ্চিমাদের এনজিও আর ধর্মপ্রচারের উর্বর ক্ষেত্র যেন আজও আগের মতোই প্রসারিত। দরিদ্র দেশগুলোতে এনজিওরা নানা কাজে জড়িয়ে পড়ে। মানবিক এসব কাজকর্মের পেছনে পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোর অর্থ সাহায্য যায়। গরিবী ঠিক উবে যায় না, তবে ভোগবাদী অর্থনীতির সূত্রটা ধরিয়ে দেওয়া যায় উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে।

এই ভাবনা তখন মাথার ভেতর ঘুরছিল—তবে তার নির্যাস, অন্য এক সময়ে বলা যাবে।

জুরি—নাম শুনেই মনে হলো, এ নামের মধ্যেই আছে একরাশ সূর্যের আলো আর মাটির গন্ধ।

কথায় কথায় জানা গেল, জুরি নাইরোবি আর নিউইয়র্কের মধ্যে নিয়মিত যাত্রী।

জুরি বলছিল, 'নাইরোবিতে পৌঁছেই তোমার চোখে প্রথম ধাক্কাটা দেবে আলো। এমন আলো তুমি নিউইয়র্কে পাবে না।'

সত্যিই তো—নিউইয়র্কে এখন শীতের আগমনী, সূর্য যেন ম্রিয়মাণ। বিমানের জানালা দিয়ে যখন নিচে তাকাই, দেখি আকাশের আলোও যেন এক কৃষ্ণ সুন্দরীর হাসির মতো—ঝলসে ওঠে, আবার হঠাৎ লজ্জায় ম্লান হয়ে যায়।

'আমাদের কৃষ্ণ সুন্দরীরা হাঁটলে তাদের সঙ্গে হাঁটে আফ্রিকার ইতিহাস। মাসাইমারার ধুলো, কিলিমানজারোর বাতাস, উপনিবেশের বেদনা।'

শুনে যাই। জুরির কথার ভেতর যেন বেজে ওঠে আফ্রিকার ছন্দ।

জুরি সমাজবিজ্ঞান পড়ায় নিউজার্সির এক কলেজে। শিক্ষক মানুষ—তাই হয়তো পৃথিবীটাকে ব্যাখ্যা করতে ভালোবাসে। আমি বললাম, 'তুমি তো সমাজবিজ্ঞান নয়, সাহিত্য পড়ালে ভালো করতে।'

হেসে বলল, 'তুমি সাহিত্যিক বলেই এমন ভাবো!'

জুরির কাছ থেকে জানলাম, সোয়াহিলি ভাষায় জুরি মানে সুন্দর।

'তুমি তোমার নামের মতোই সুন্দর।'

'সব পুরুষ এমনটাই বলে!' তারপর দুজনেই চুপ। মনে মনে ভাবলাম—প্রেমও মনে হচ্ছে আফ্রিকার সূর্যের মতো। তেজি, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী।

জুরির সাজগোজ নেই। অথচ মনে হয়, তার ত্বকেই এক অদ্ভুত আলো লেগে আছে। যেন সে নিজেই এক ভাষা। বিমানে হালকা আলো-আঁধারির মাঝে আমরা দুজন নীরব। সময় কেটে যায়, নাইরোবি তখনও দূরে।

হঠাৎ জুরি বলল, 'তুমি কি এয়ারপোর্ট থেকে রাইড চাও, সাংবাদিক?'

আমি বললাম, 'ধন্যবাদ, রাইড লাগবে না। গল্পের মানুষ আমি। আমাকে আফ্রিকান গল্পের খোঁজ দাও।'

'তাহলে তুমি তো ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা গল্প পেয়ে গেছো।'

চুপ করে কফিতে চুমুক দিই। কফি তেতো, কিন্তু তৃপ্তিকর।

পাশে বসে থাকা কৃষ্ণ সুন্দরীকে চলমান কবিতার মতো মনে হয়—যার প্রতিটি শব্দে আফ্রিকার গোধূলি, প্রতিটি বিরতিতে এক চুপচাপ আকর্ষণ। তার হাতে চিমামান্ডা আদিচির *Purple Hibiscus* বই। বললাম, বইটা আমি পড়েছি। বইয়ের একটা লাইন এখন মনে পড়ছে—'When she smiled, her eyes seemed to breathe.' (মেয়েটি হাসলে, তার চোখ যেন শ্বাস নিত।)

জুরি হেসে বলল, 'Come and come again to Africa, storyteller.'

'প্রতি যাত্রায় তুমি পাশে থাকলে গল্প না লিখে কবি হয়ে যেতে পারি।'

'তাহলে লিখে ফেলো—কেনিয়ায় পৌঁছানোর আগেই কবি হয়ে গিয়েছিলে।'

বিমানের জানালায় তখন ভোরের আলো। নিচে আফ্রিকার মাটি। আর আমার মনে— এক দীর্ঘ কবিতার শিরোনাম—জুরি, নাইরোবির কৃষ্ণ সুন্দরী।

হোটেলে পৌঁছে দেখি মাসুম মাহবুব ভাই অপেক্ষা করছেন।